ভাষার ইতিহাস (বই বহির্ভূত)

বাংলা ভাষা একদিনে তৈরি হয়নি। বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরাতন। ধারণা করা হয় বাংলা ভাষার মূল উৎস বৈদিক ভাষা। অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গকামরূপী ভাষা হতে বাংলা ভাষার জন্ম। বঙ্গকামরূপী বিভাজনটি ব্যাকরণবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর করা। পাওয়া তথ্য অনুসারে, 'চর্যাপদ বা চর্যাগীতি'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। এটি বৌদ্ধকবিদের দ্বারা রচিত একটি সংগীত বা কাব্য সংকলন। ২৪ জন কবির ৩৯টি (পূর্ণ ৩৬টি, ছেঁড়া ৩টি) গীতিকবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। এটি ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে সংগ্রহ করে ১৯১৬ সালে হাজার বছরের পুরাণ বাংলা বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটি মধ্যযুগের আদি কবি বড়ুচণ্ডীদাস রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এটি বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থবাড়ির গোয়ালঘর থেকে পুঁথিকাব্যগ্রন্থটি সংগ্রহ করে ১৯১৬ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশ করেন। কাব্যপাণ্ডুলিপির প্রথম, মধ্য ও শেষের কিছু পাতা পাওয়া যায়নি তবে ভণিতা থেকে জানা গেছে এটি বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যপাণ্ডুলিপি। ৪১৭টি পদ নিয়ে পুঁথিটি রচিত হয়েছে যা কৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ভাষার সংজ্ঞা

মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠধ্বনি এবং হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঙ্গিত করে থাকে। কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে ইঙ্গিতের সাহায্যে ততটা পারে না। আর কণ্ঠধ্বনির সহায়তায় মানুষ মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। কণ্ঠধ্বনি বলতে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, নাসিকা ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সৃষ্টি হয় বাগ্যন্ত্রের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত, নাসিকা ইত্যাদি বাক্প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগযন্ত্র। এই বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে। সকল মানুষের ভাষাই বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট। তবুও একই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা। দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। ফলে এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে, হাজার বছর আগেকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

তথ্য: ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠে একটি রিপোর্টে প্রকাশিত

বাংলা ভাষারীতি (সাধুরীতি ও চলিত রীতি)

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষাই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষা যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের লোকের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। কারণ তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্য রীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি।

যেমন :

১. প্রমিত রীতি / Standard colloquial language

২. আঞ্চলিক কথ্য রীতি / Regional Colloquial Style

বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি।

যেমন :

১. চলতি রীতি / Standard colloquial language

২. সাধুরীতি / Regional written form

সাধু রীতি

সাধু পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত ভাষাই সাধুরীতির ভাষা। সাধুরীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

ক) বাংলা লেখ্য সাধুরীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।

খ) এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।

গ) সাধুরীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।

ঘ) এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।

চলিত রীতি

লেখক প্রমথ চৌধুরীকে চলিত গদ্যের জনক বলা হয়। বিশিষ্ট লেখক ও ব্যাকরণবিদগণ যে শিষ্টভাষা রীতি তৈরি করলেন তাই চলিত রীতি। চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

ক) চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।

খ) এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।

গ) চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।

ঘ) সাধুরীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

আঞ্চলিক কথ্য রীতি

সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাংলা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়।

সাধুরীতি ও চলিত রীতির নমুনা

কাজী ইমদাদুল হক ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজন লেখকের রচনা থেকে সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য দেখা যেতে পারে। যেমন:

সাধুরীতি

পরদিন প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের প্রস্তুত লিস্ট অনুসারে যে তিনজন শিক্ষক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আটটার পূর্বেই ডাক-বাংলায় উপস্থিত হইলেন। একটু পরে আবদুল্লাহ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনি যে! আপনার নাম তো হেডমাস্টার লিস্টে দেন নাই। কাজী ইমদাদুল হক

চলিত রীতি

পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপরের 'ক'ও 'খ' অনুচ্ছেদ দুটির ভাষার উপাদানে সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য নিচে দেখানো হলো-

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	মস্তক জুতা	মাথা জুতো
বিশেষণ	শুষ্ক বন্য	শুকনো বুনো
সর্বনাম	তাঁহারা/উহারা তাহার/তাঁহার	তাঁরা/ওঁরা তার/তাঁর
ক্রিয়া	করিবার পাইয়াছিলেন হইলেন আসিয়া হইল দেখিয়া করিলেন দেন নাই পার হইয়া	করবার/করার পেয়েছিলেন হলেন এসে হল/হলো দেখে করলেন দেননি পেরিয়ে

	পড়িল করিয়া ভাঙিয়া যাইতে লাগিল ফুটিয়া রহিয়াছে	পড়ল/পড়লো করে ভেঙে যেতে লাগল ফুটে রয়েছে
অব্যয়	পূর্বেই	আগেই
অনুসর্গ	সহিত বিহনে	সঙ্গে/সাথে ছাড়া

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার

বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে এর শব্দসম্ভার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পত্তনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। বাংলা ভাষা ঐ সব ভাষার শব্দগুলো আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষায় যেসব শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে সেসব পণ্ডিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন : তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দ, দেশি শব্দ, বিদেশি শব্দ।

তৎসম/সংস্কৃত শব্দ

যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বা হুবহু বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার)+সম (সমান)]=তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম শব্দ

বাংলা ভাষায় যেসব সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ বা সামান্য পরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় এসেছে সেসব শব্দকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধতৎসম মানে আধা সংস্কৃত। যেমন : জোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নি, বোষ্টম, কুচ্ছিত। এগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎসিত শব্দ থেকে আগত।

তদ্ভব শব্দ

যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় এসেছে সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, 'তৎ' (তার) থেকে 'ভব' (উৎপন্ন)। যেমন : সংস্কৃত-হস্ত, প্রাকৃত-হত্থ, তদ্ভব-হাত। সংস্কৃত-চর্মকার, প্রাকৃত-চম্মআর, তদ্ভব-চামার ইত্যাদি। এই সব তদ্ভবশব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

দেশি শব্দ

যেসব শব্দ বাংলাদেশের কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে সেসব শব্দকে দেশি শব্দ বলে। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন : কুড়ি (বিশ)-কোলভাষা, পেট (উদর)-তামিল ভাষা, চুলা (উনন)-মুন্ডারী ভাষা।

এরূপ : কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

বিদেশি শব্দ

যেসব শব্দ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহুশব্দ বাংলায় স্থান করে নিয়েছে সেসব শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। এদের মধ্যে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি প্রভৃতি দেশ। এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার/বার্মা, মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

আরবি শব্দ

বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

ধর্মসংক্রান্ত শব্দ

আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।

প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ

আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায় ইত্যাদি

ফারসি শব্দ

বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

ধর্মসংক্রান্ত শব্দ

খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।

প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ

কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।

বিবিধ শব্দ

আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে

ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।

পরিবর্তিত উচ্চারণে

আফিম/ Opium, অফিস/ Office, ইস্কুল/ School, বাক্স/বাকশ/ Box, হাসপাতাল / Hospital, বোতল / Bottle ইত্যাদি।

ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার শব্দ

পর্তুগিজ	:	আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি
ফরাসি	:	কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ
ওলন্দাজ	:	ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন
গুজরাটি	:	খদ্দর, হরতাল
পাঞ্জাবি	:	চাহিদা, শিখ
তুর্কি	:	চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা
চিনা	:	চা, চিনি
মায়ানমার/বার্মিজ	:	ফুঙ্গি, লুংগি
জাপানি	:	রিকশা, হারিকিরি

মিশ্রশব্দ

তৎসম, দেশি অথবা বিদেশি শব্দে মিলনে যেসব শব্দ গঠিত হয় সেসব শব্দকে মিশ্রশব্দ বলে। কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত গঠিত হয়ে থাকে। যেমন :

রাজা-বাদশা (তৎসম ও ফারসি) হাট-বাজার (বাংলা ও ফারসি)

হেডমৌলবি (ইংরেজি ও ফারসি) হেডপণ্ডিত (ইংরেজি ও তৎসম)

খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি ও তৎসম) ডাক্তারখানা (ইংরেজি ও ফারসি)

পকেটমার (ইংরেজি ও বাংলা) চৌহদ্দি (ফারসি ও আরবি)

পারিভাষিক শব্দ

বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ। যেমন :

অম্লজান- oxygen

উদযান- radio

নথি- file

প্রশিক্ষণ- training

ব্যবস্থাপক- manager

বেতার- radio

মহাব্যবস্থাপক- general manager

সচিব- secretary

স্নাতক- graduate

স্নাতকোত্তর- post graduate

সমাপ্তি- final

সাময়িকী- periodical

সমীকরণ- equation

বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত-যে ভাষা থেকেই আসুক না কেনো এখন তা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। এগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, বাংলা থেকে আলাদা করে এদের কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন : টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, স্যাটেলাইট ইত্যাদি প্রচলিত শব্দের কঠিনতর বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাকরণের ইতিহাস (বই বহির্ভূত)

ভাষার মতো বাংলা ব্যাকরণও একদিনে তৈরি হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২০০ সালে ব্যাকরণবিদ পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণকে ব্যাকরণ কৌমুদী নামে বাংলা অনুবাদ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ব্যাকরণের আদলে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা হয়। এরপর ইংরেজি গ্রামার অনুসারে বাংলা ব্যাকরণকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। ব্যাকরণের সব নিয়মই একদিনে ব্যাকরণ বইতে উপস্থাপন করা হয়নি। ধাপে ধাপে তা উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮২০ সালে সন্ধি যুক্ত হয়, ১৮৫০ সালে তা বিস্তর ব্যবহার হয়। এরপর সমাস, লিঙ্গ/চিহ্ন, প্রত্যয়, ণত্ব, ষত্ববিধান সংযুক্ত হয়। ১৯৬০ সালের দিকে ছন্দ, অলংকার যুক্ত হয়। ২০১৪ সালে রস যুক্ত হয়।

বাংলা ব্যাকরণ পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম রচনা করেন মনুয়েল দা আসুম্পসাঁও ১৭৩৩ সালে। এরপর বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ‘Grammar of the Bangali Language’ ভাষায় প্রথম রচনা করেন হ্যালহেড ১৭৮৩ সালে। হেলহেডই ব্যাকরণ লেখার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। প্রথম বাঙালি বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায় ‘A Grammar of the Bengali Language’ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে। পরে এর নামকরণ করেন ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’।

ব্যাকরণের সংজ্ঞা, পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (বি + আ + কৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে। ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও সেসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয় তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণ আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন :

১. ধ্বনি / Sound

২. শব্দ / Word

৩. বাক্য / Sentence

৪. অর্থ / Meaning

সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়-

১. ধ্বনিতত্ব / Phonology

২. শব্দতত্ব বা রূপতত্ব / Morphology

৩. বাক্যতত্ব বা পদক্রম / Syntax

৪. অর্থতত্ব / Semantics

এ ছাড়া অভিধানতত্ব / Lexicography, ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ধ্বনিতত্ব

ধ্বনি : মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহবা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলা হয়। বাকপ্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (Phoneme) বলা হয়।

বর্ণ: বাকপ্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষায়ই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন / Symbol ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ/ Letter। যেমন : বাংলায় 'বক' কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'ব', ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় I ই বা n (বি)। আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয়-(বে)।

ধ্বনিতত্বে আলোচিত হয় ধ্বনি, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, বর্ণ বিন্যাস, বানান-উচ্চারণ, ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণত্ববিধান, ষত্ববিধান ও ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি ইত্যাদি।

রূপতত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ / morpheme। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্বকে রূপতত্ব / Morphology বলা হয়।

শব্দতত্ব বা রূপতত্বে আলোচিত হয় শব্দ ও পদের গঠন, ক্রিয়ার কাল, সংখ্যা, বচন, নির্দেশক, উপসর্গ, বিভক্তি, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, ধাতু, প্রত্যয়, অনুসর্গ, চিহ্ন/লিঙ্গ, পক্ষ/পুরুষ, কারক, সমাস, দ্বিরুক্তি ইত্যাদি।

বাক্যতত্ব

মানুষের বাক্প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্ট অর্থবোধক বাকপ্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য/ Sentence। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

বাক্যতত্বে আলোচিত হয় বাক্য প্রকরণ, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্যের গঠনপ্রণালী, বাগধারা, বাক্য ও পদক্রম, উক্তি, বাচ্য, যতি ইত্যাদি।

অর্থতত্ব

অর্থতত্বে আলোচিত হয় শব্দ ও বাক্যে অর্থবিচার, অর্থের বিভিন, মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ বা ভিন্নার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, এককথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন ইত্যাদি।

বাংলা ব্যাকরণের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য পণ্ডিতেরা কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োজনীয় কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো।

পারিভাষিক শব্দগুলো হলো প্রাতিপদিক, সাধিত শব্দ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি।

প্রাতিপদিক

বিভক্তিহীন নামশব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন : হাত, বই, কলম ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ

মৌলিক শব্দ ব্যতীত অন্য সব শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন : হাতা, গরমিল, দম্পতি ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার। যেমন : নামশব্দ ও ক্রিয়া।

প্রত্যেকটি সাধিত শব্দ বা নামশব্দের ও ক্রিয়ার দুটি অংশ থাকে। যেমন : প্রকৃতি ও প্রত্যয়।

প্রকৃতি

যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না তাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দুই প্রকার। যেমন : নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি : হাতল, ফুলেল, মুখর-শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই-হাত+ল=হাতল (বাঁট), ফুল+এল=ফুলেল (ফুলজাত) ও মুখ+র=মুখর (বাচাল)। হাত, ফুল ও মুখ ইত্যাদি শব্দকে বলা হয় প্রকৃতি বা মূল অংশ। এগুলোর নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : আবার চলন্ত, জমা ও লিখিত-শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই-Öচল্+অন্ত=চলন্ত (চলমান), Öজম্ +আ= জমা (সঞ্চিত) ও Öলিখ্+ইত= লিখিত (যা লেখা হয়েছে)। এখানে চল্, জম্ ও লিখ্ তিনটি ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অংশ। এদের বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

*'প্রকৃতি' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

প্রত্যয়

শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে শব্দ বা নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে। কয়েকটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো :

নাম প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
হাত	+ ল	হাতল
ফুল	+ এল	ফুলেল
মুখ	+ র	মুখর

ক্রিয়া প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
√চল্	+ অন্ত	চলন্ত
√জম্	+ আ	জমা

বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন : তদ্ধিত প্রত্যয় ও কৃৎপ্রত্যয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দমূল বা নাম শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন : হাতল, ফুলেল ও মুখর শব্দের যথাক্রমে ল, এল ও র তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎপ্রত্যয় : ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে কৃৎপ্রত্যয়। যেমন : চলন্ত, জমা ও লিখিত শব্দের যথাক্রমে অন্ত, আ ও ইত কৃৎপ্রত্যয়।

তদ্ধিতান্ত শব্দ : তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় তদ্ধিতান্ত শব্দ। যেমন : হাতল, ফুলেল ও মুখর।

কৃদন্ত শব্দ : কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। যেমন : চলন্ত, জমা ও লিখিত।

*'প্রত্যয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

উপসর্গ

শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। এদের বলা হয় উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হলেই অর্থবাচকতা সূচিত হয়। যেমন : 'পরা' একটি উপসর্গ, এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'জয়' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে হলো 'পরাজয়'। এটি জয়ের বিপরীতার্থক। সেইরূপ 'দর্শন' অর্থ দেখা। এর আগে 'প্র' উপসর্গ যুক্ত হয়ে হলো 'প্রদর্শন' অর্থাৎ সম্যকরূপে দর্শন বা বিশেষভাবে দেখা।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকারের উপসর্গ দেখা যায়। যেমন :

১. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ : প্র, পরা, অপ-এরূপ বিশটি সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ রয়েছে। তৎসম উপসর্গ তৎসম শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'পূর্ণ' একটি তৎসম শব্দ। 'পরি' উপসর্গযোগে হয় 'পরিপূর্ণ'। √হৃ (হর)+ঘঞ='হার'-এ কৃদন্ত শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করলে কীরূপ অর্থের পরিবর্তন হলো লক্ষ কর : আ+হার= আহার (খাওয়া), বি+হার=বিহার (ভ্রমণ), উপ+হার= উপহার (পরিতোষিক), পরি+হার=পরিহার (বর্জন) ইত্যাদি।

২. বাংলা উপসর্গ : অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি ইত্যাদি অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ বাংলা উপসর্গ। খাঁটি বাংলা শব্দের আগে এগুলো যুক্ত হয়। যেমন : অ+কাজ=অকাজ, অনা+ছিষ্টি (সৃষ্টি শব্দজাত)=অনাছিষ্টি ইত্যাদি।

৩. বিদেশি উপসর্গ : কিছু বিদেশি শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বিদেশি উপসর্গ বিদেশি শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা : বেহেড, লাপাত্তা, গরহাজির ইত্যাদি।

*'উপসর্গ' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

অনুসর্গ

বাংলা ভাষায় দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, চেয়ে, থেকে, উপরে, পরে, প্রতি, মাঝে, বই, ব্যতীত, অবধি, হেতু, জন্য, কারণ, মতো, তবে ইত্যাদি শব্দ কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো কখনো শব্দবিভক্তির ন্যায় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে। এদের অনুসর্গ বলা হয়। যেমন : কেবল আমার জন্য তোমার এ দুর্ভোগ। মনোযোগ দিয়ে শোন, শেষ পর্যন্ত সবার কাজে আসবে।

*'অনুসর্গ' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে